
বিদ্রোহী ভারত

বাংলা দ্রুত পঠনের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের [redacted] জন্য লিখিত ১২৫১ই. ডি. এন (পি) তাং ৩০. ৩. ৭৮

বিদ্রোহী ভারত

4'6

৮৯৪

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ

নৈহাটি, ২৪ পরগনা

দী পি কা

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৬এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৮৩

মূল্য—[redacted]টাকা মাত্র।

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, ১৬এ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৃণালকান্তি ঘোষ, নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, ২১।১, অবিনাশ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬, কর্তৃক মুদ্রিত।



পলাশীর যুদ্ধ

অন্ধকার রাত্রি। পথে লোকজন নেই। এমন সময় নবাব-প্রাসাদের গোপন দরজাটা খুলে গেল। সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো তিনটি মানুষ। এদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথ চলতে লাগলো তারা।

যেতে হবে তাদের সুদূর কাটোয়ায়। তারপর সেখান থেকে বিহারের রাজধানী পাটনায়। সেখানকার শাসনকর্তা রাজা জানকীরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

শত্রুপক্ষ এদের ধরবার জন্যে চারদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছে। তাই সাবধানে এগিয়ে যেতে লাগলো তারা। কিছুক্ষণ পথ চলার পর স্ত্রীলোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আর হাঁটতে পারছে না সে।

সঙ্গী দু'জন তখন বিপদে পড়লো। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। পূর্ব-দিকের আকাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে উষার আলো। আর পথের মাঝে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

ভোরের আবছা আলোয় তারা দূরে একটা কুটির দেখতে পেলো। তখন অপর সঙ্গীটিকে অনেক বুঝিয়ে তারা তিনজনে সেই কুটির লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো। সেখানে এসে তারা দেখলো সেটি ফকিরের আস্তানা। তারা ডাক দিতেই ফকির বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ

কথাবার্তার পর ফকিরের মনে সন্দেহ হলো। এরা কে? এদের দেহে রয়েছে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ। অথচ আশ্রয়হীন হয়ে এরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এরা কি তবে সেই লোক? যাদের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?

এই কথা মনে হতেই ফকির তাদের বসিয়ে রেখে সংবাদ দিল শত্রুপক্ষের কাছে। তারা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো ফকিরের আস্তানায়। তারপর ধরে নিয়ে গেল তাদের তিনজনকে। কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো তিনজনকে। তারপর নির্মমভাবে হত্যা করা হলো এদের একজনকে।

এইভাবে শেষ হয়ে গেল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-দৌল্লার জীবন। সেদিন তাঁর যে দু'জন সঙ্গী ছিল, তাদের একজন তাঁর স্ত্রী লুৎফাউন্নিসা, অপরজন নবাবের বিশ্বাসী ভৃত্য।

সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বুকে নেমে এলো অন্ধকার। একদল বিদেশী লোক এসে এদেশে জাঁকিয়ে বসলো। অন্যায় শাসন আর শোষণে দেশবাসী অস্থির হয়ে পড়লো। কিন্তু সত্যিই যিনি দেশকে ভালোবেসেছিলেন, দেশবাসীরা তাঁকে ভুল বুঝলো। কতকগুলি বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে পড়ে তাঁকে অকাল-মৃত্যুবরণ করতে হলো।

সিরাজের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ছিলেন—ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ আর দেওয়ান রাজবল্লভ। নিজেদের প্রতিহিংসার জ্বালা মেটাতে গিয়ে এরা ইংরেজদের হাতে তুলে দিল এই দেশ। কিন্তু কেন এই ব্যাপার ঘটেছিল?

দীর্ঘ ষোল বছর নবাবী করে বৃদ্ধ বয়সে আলিবর্দ্দী খাঁ চিন্তায় পড়লেন—তাঁর মৃত্যুর পর কে নবাব হবেন? তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না; ছিল শুধু তিনটে মেয়ে।

আলিবর্দ্দী তাঁর ছোট মেয়ে আমিনার বড় ছেলে সিরাজকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। সিরাজও

দাদুকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। তাই মরার আগে আলিবর্দ্দী সিরাজকেই নবাবী দিয়ে গেলেন।

বড় মেয়ে ঘসেটির এই ব্যাপারে রাগ হলো। সে সিরাজকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। সিরাজ তাকে নজরবন্দী করে রাখলেন। এই সময় ঘসেটির সঙ্গে এসে যোগ দিল সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ, দেওয়ান রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকেরা।

সেই সময় কলিকাতায় ইংরেজরা, আর চন্দননগরে ফরাসীরা দুর্গ তৈরী ক'রে সৈন্যসামন্ত আমদানি করে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সিরাজ বিদেশীদের আগে থেকেই ভালো চোখে দেখতেন না। তাই তিনি ইংরেজ আর ফরাসীদের উপর কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ফরাসীরা কিছুটা নতি স্বীকার করলো বটে, কিন্তু ইংরেজরা নবাবের আদেশ অমান্য করলো।

সিরাজ ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে কলিকাতা দখল করলেন এবং সেনাপতি মানিকচাঁদের হাতে কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়ে ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে। ইংরেজরা বেগতিক দেখে মাদ্রাজে সেনাপতি ক্লাইভের কাছে সংবাদ পাঠালো। খবর পেয়ে ক্লাইভ নৌ-সেনাপতি ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে এসে পুনরায় কলিকাতা অধিকার করলো। তারপর চন্দননগর অধিকার করে ফরাসীদের তাড়িয়ে দিলে ফরাসীরা নবাব সিরাজের শরণাপন্ন হলো।

নবাব নিরুপায় হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এদিকে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি যোগ দিল ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইভের সঙ্গে। ঘসেটি বেগমও যোগ দিল সেই সঙ্গে। ইংরেজরাও সুযোগ ছাড়লো না। তারা পরামর্শ করতে লাগলো কি ভাবে সিরাজকে আক্রমণ করা যায়। অবশেষে সিরাজ সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করেছেন, এই অজুহাত দেখিয়ে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

পলাশীর আমবাগানে ক্লাইভ সৈন্য সমাবেশ করলো। তার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার সৈন্য। নবাব পঞ্চাশ হাজার পদাতিক আর আঠাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ক্লাইভকে বাধা দিলেন।



লর্ড ক্লাইভ

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আর রাজবল্লভ ইংরেজ-সৈন্যদের বাধা তো দিলেনই না, বরং তাদের সাহায্য করতে লাগলেন। শুধুমাত্র সিরাজের হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ মোহনলাল, মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ মীরমদন আর কয়েকজন ফরাসী সেনাপতি প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ক্লাইভ বিপদ বুঝে পিছু হটতে লাগলো। হঠাৎ গোলার আঘাতে মীরমদন নিহত হলেন। মোহনলাল একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সেদিন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালী সেনাপতি মোহনলাল তাঁর জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় যে ভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, আজও সেই কথা স্মরণ করে বাঙালী জাতির বুক গর্বে ফুলে ওঠে। সেনাপতি মোহনলালের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি সিরাজকে যুক্তি দিলেন যে মোহনলাল যেন যুদ্ধ না করে।

মীরজাফরের কথায় বিশ্বাস করে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার হুকুম দিলেন। যুদ্ধ থেমে গেল।

ঠিক সেই সময় ক্লাইভ, রাজবল্লভ আর মীরজাফরের সাহায্যে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো নবাব সৈন্যদের উপর। তারা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ইংরেজের গোলার আঘাতে

মৃতদেহের স্তূপ জমে গেল পলাশীর রণক্ষেত্রে। শেষ হয়ে গেল পলাশীর যুদ্ধ।

নবাব সিরাজ ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে। তারপর গোপনে পত্নী লুৎফাউন্নিসা ও একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়ার দিকে চললেন। তিনি আশা করেছিলেন আবার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে ইংরেজকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। কিন্তু তা আর হলো না। দানশা নামে এক ফকির তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দিল।

এইভাবে শেষ হয়ে গেল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদৌল্লার জীবন। সেই সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেল। ইংরেজরা হলো এদেশের ভাগ্যবিধাতা।

প্রশ্ন

১। সিরাজের মাতার নাম কি ? ঘসেটি বেগম কে ?

২। আলিবর্দ্দী কত বছর নবাবী করেছিলেন ? তাঁর রাজধানীর নাম কি ?

৩। পলাশীর রণক্ষেত্রে নবাব পক্ষে কত সৈন্য ছিল ?

৪। ইংরেজ সৈন্যদলের প্রধান কে ছিল ?

৫। সিরাজকে কে ধরিয়ে দিয়েছিল ?

৬। সিরাজের বাঙালী সেনাপতির নাম কি ?



সিপাহী বিদ্রোহ

জায়গাটার নাম ব্যারাকপুর। ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা শহর। বর্তমানে এটি বৃহত্তর কলিকাতা শহরেরই একটি অংশ বিশেষ। যখনকার কথা বলছি তখন এটি ছিল একটি গ্রাম। এখানে ইংরেজদের একটি সেনানিবাস থাকায় জায়গাটার একটা গুরুত্ব ছিল তখনকার দিনেও॥ এই সৈন্যশিবিরে ইংরেজদের সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ মোতায়েন থাকতো। এদের মধ্যে শুধু ইংরেজ সৈন্যই ছিল না, নানা জাতের সৈন্য থাকতো এখানে।

হঠাৎ একদিন সৈন্যশিবিরে একটা থমথমে ভাব দেখা গেল। ভারতীয় সৈন্যদের চোখে মুখে যেন একটা চাপা আগুন। যে সেনানিবাস সব সময় সরগরম থাকতো, সেখানে আজ নীরবতা বিরাজ করছে। শুধু কয়েকজন এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করছে। কেউ কেউ আবার গোপনে কিসের যেন পরামর্শ করছে।

হঠাৎ সেই নির্জনতা ভেদ করে টহলদার ফৌজ চীৎকার করে উঠল —হঠ্ যাও—হঠ্ যাও। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ। একটার পর একটা, তারপর আবার একটা, এইভাবে গুলির পর গুলি চলতে লাগলো। আহত গোরা সৈন্যদের আর্তনাদে আর গুলির ধোঁয়ায় সৈন্যশিবির যেন একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। প্রাণ ভয়ে যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো।

আজ থেকে একশো একুশ বছর আগে এই ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যরা যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল তাতে

শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতের বুকে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন।

আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল তাই বলছি। নবাব সিরাজদৌল্লার পতনের পর ইংরেজরা নানা কৌশলে বাংলাদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসলো। তারপর তারা সারা ভারতবর্ষে তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে মন দিল।

তখন ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। পুত্রহীন রাজারা তখন অন্যের পুত্র নিয়ে নিজেদের পুত্র রূপে লালনপালন করতেন। পিতার অবর্তমানে এরাই সিংহাসনের অধিকারী হতো। লর্ড ডালহৌসী ভারতের গর্ভনর হয়ে এসে এই প্রথা তুলে দিলেন। এর ফলে যে সব রাজাদের ছেলেপুলে হয়নি সেই রাজ্যগুলো ইংরেজরা দখল করতে লাগলো।

ভারতবাসীরা ইংরেজের কুমতলব বুঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এই সময় অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজ রাজ্যচ্যুত করলো। তার ফলে ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কি ভাবে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো যায় তারই পরামর্শ চলতে লাগলো চারদিকে।

মহারাষ্ট্রের রাজা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র নানাসাহেব রাজ্যের রাজা হলেন। ইংরেজরা এতে বাধা দিল এবং নানাসাহেবকে রাজ্যচ্যুত করে মহারাষ্ট্র দখল করলো। এর ফলে মারাঠা জাতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ইংরেজরা উপায়ান্তর না দেখে নানাসাহেবের জন্যে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিল। কিছুদিন এই বৃত্তি দেওয়ার পর হঠাৎ ইংরেজরা তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দিল।

নানাসাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মারাঠা সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী, অযোধ্যার মন্ত্রী আহম্মদউল্লা, আজিমউল্লা খান, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের রাজপুত নেতা কুঙার সিং এবং মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরোজ শাহ।

এই সময় ইংরেজরা 'এনফিল্ড' নামে একরকম রাইফেল চালু করে। এর টোটাগুলো ভরতে হতো দাঁত দিয়ে কেটে। বিদ্রোহীরা এই সুযোগ ছাড়লো না। তারা প্রচার করলো ঐ রাইফেলের টোটায় গোরু আর শূকরের চর্বি মেশানো আছে। সৈন্যদলে এই সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো। হিন্দু আর মুসলমান সৈন্যরা ভাবলো ওই চর্বি মেশানো টোটার দ্বারা তাদের ধর্মচ্যুত করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় সৈন্যদের মধ্যে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে নামে একজন সৈন্য ইংরেজ ক্যাপ্টেনের আদেশ অমান্য করে, ইংরেজ-সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে অনেক গোরা সৈন্যকে তিনি হত্যা করলেন।

অনেক চেষ্টায় ইংরেজ এই বিদ্রোহ দমন করলো। মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হলো। বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো। এ সব সংবাদ কিন্তু গোপন রইলো না, ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো এই সংবাদ।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটো মাস। কানপুর সৈন্যশিবিরে হঠাৎ জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। সেখানকার ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজ অফিসারদের নির্মমভাবে হত্যা করলো। ইংরেজের রক্তে লাল হয়ে উঠলো কানপুরের মাটি।

ইংরেজরা প্রবলভাবে দমন করতে চেষ্টা করলো এই বিদ্রোহ। কিন্তু মাত্র একমাসের মধ্যে নাসিরাবাদ, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ও বেনারস প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহের আগুন।

দিল্লীর সেনানিবাসের বিদ্রোহী সৈন্যদল দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করে রাজ্যচ্যুত মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করলো। বেগতিক দেখে ভারতের গর্ভনর লর্ড ক্যানিং সামরিক আইন জারি করলেন। বিদেশী রাজপুরুষ এবং তাদের

অনুগত লোকেরা অত্যাচার চালাতে লাগালো নিরীহ ভারতীয়দের উপর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

নানাসাহেব আর তাঁতিয়া তোপী কানপুরে ইংরেজ-শিবিরে হানা দিয়ে অনেক ইংরেজ নারী ও পুরুষকে হত্যা করলেন। এরপর বিশ হাজার বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে তাঁতিয়া তোপী এলাহাবাদে ইংরেজ সৈন্যদের পরাজিত করে এলাহাবাদ দখল করলেন।

এদিকে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহী হয়েই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বিদ্রোহী সৈন্যদের নিয়ে তাঁতিয়া তোপী। এই বিদ্রোহ দমন করতে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া গোপনে ইংরেজদের সাহায্য করছিল। এই কারণে তাঁতিয়া তোপী ও ঝান্সীর রানী একযোগে আক্রমণ করলেন গোয়ালিয়র দুর্গ।



ঝান্সীর রানী

সিন্ধিয়া বাধা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো। সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করলেন। তারপর নানাসাহেবকে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইংরেজরা তখন বিদ্রোহ দমন করতে বহু সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ফেলেছে। এই সব সৈন্যদল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ করলো। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের এটাই হল প্রথম প্রচেষ্টা।

উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হলো। প্রবল পরাক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন ভারতের বীর রমণী ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ। ঘোড়ায় চড়ে এই বীর নারী ইংরেজ-সৈন্যদের বিপর্যস্ত

করে তুললেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে পালাতে লাগলো অনেক ইংরেজ-সৈন্য। কিন্তু সহসা শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে নিহত হলেন লক্ষ্মীবাঈ। বিদ্রোহী সৈন্যদল হতাশ হয়ে পড়লো। তাঁতীয়া তোপী এগিয়ে এসে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি দুরন্ত গতিতে ইংরেজ-সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলেন না। আহত হয়ে ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন।

অপরদিকে নানাসাহেবও প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর, কাশ্মীরের সর্দার গুলাব সিংহ, সিন্ধিয়া, নেপালের গোর্খা মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিল। ফলে নানাসাহেব পরাজিত হয়ে নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন।

ক্ষিপ্ত ইংরেজ এগিয়ে চললো দিল্লীর দিকে। তারা ভারতের রাজধানী দিল্লী অধিকার করলো। লুঠ করলো দিল্লী শহর। শহরবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার করতে লাগলো। বাহাদুর শাহকে বন্দী করল। সম্রাটের পরিবার বর্গের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলো। বাহাদুর শাহের ছেলে ও নাতি নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন! কিন্তু ইংরেজরা তাদের গুলি করে হত্যা করলো। তাঁতিয়া তোপীকে ধরে এনে ফাঁসি দেওয়া হলো। এইভাবে একে একে বিদ্রোহীদের দমন করে লর্ড ক্যানিং যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করলেন।


বাহাদুর শাহ্

পলাশীতে যেমন বেইমানদের সহায়তায় ইংরেজরা বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই রকম ঘর-শত্রুদের সাহায্যেই বিদ্রোহ দমন করে তারা সারা ভারতে কায়েম হয়ে বসলো।

ভারত জননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে গিয়ে শহীদ হলেনভারতের বীর নারী লক্ষ্মীবাঈ, ভারতমাতার বীর সন্তান তাঁতিয়া তোপী আর ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ে। ভারতবাসী কোনো দিন এঁদের কথা ভুলবে না। ভুলবে না ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান বীরদের শৌর্যবীর্যের গাথা। তাঁদের কথা স্মরণ করে ভারতবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করে।

প্রশ্ন

১। প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল কোথায় ?

২। হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যেরা কেন বিদ্রোহ করেছিল ?

৩। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গর্নভর কে ছিলেন ?

৪। মঙ্গল পাঁড়ে ও তাঁতিয়া তোপী কে ছিলেন ?

৫। সিপাহী বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। স্বাধীনতার প্রথম প্রচেষ্টায় কোন্ বীর নারী স্মরণীয় হয়ে আছেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

নীলবিদ্রোহ

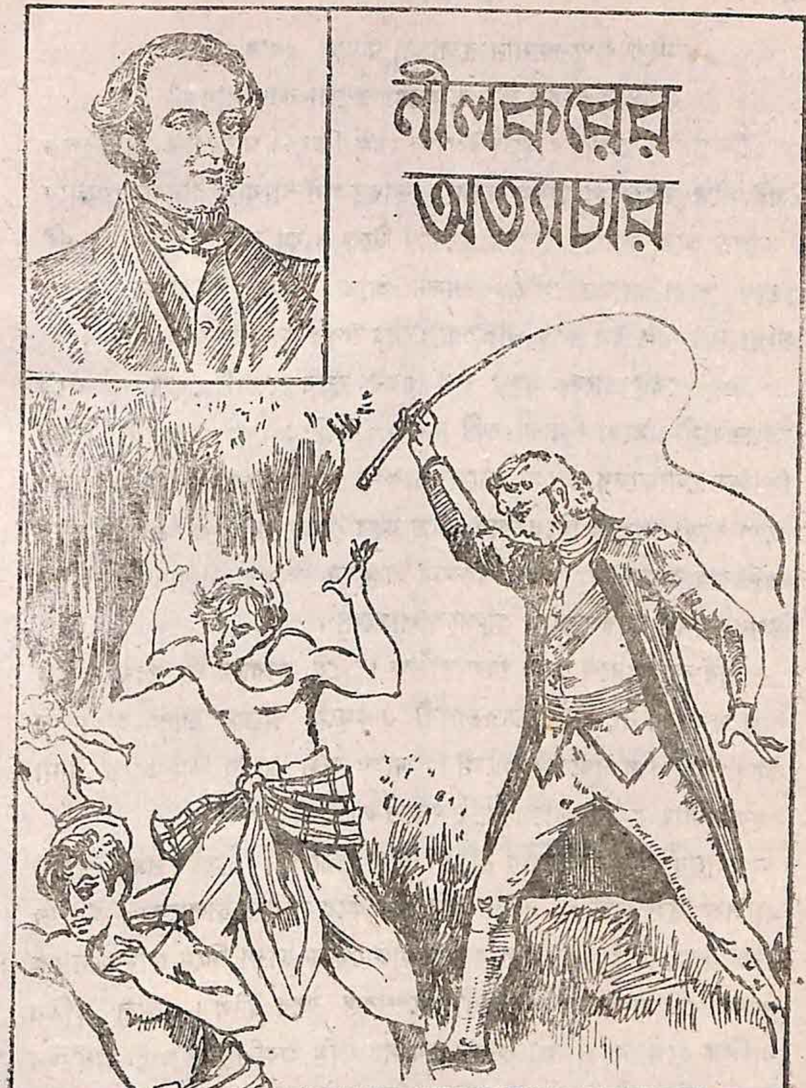
নীলকর সাহেবের কুঠি। একজন ইংরেজ কুঠিয়াল ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাগে তার লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। হাতে আছে একটা চাবুক। এমন সময় কুঠিয়ালের লোক ধরে নিয়ে এলো একজন চাষীকে। গ্রাম্য চাষী। সহজ সরল মানুষ। অথচ তাকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে।

কুঠিয়াল রাগে তার দিকে চেয়ে বললে—তুই জমিতে নীল চাষ করবি কিনা? চাষী নির্ভয়ে বললে—না হুজুর। আমি তাহলে না খেতে পেয়ে মারা যাব। ঐ সামান্য জমি, তাতে যদি ধান চাষ না করি, তাহলে ছেলেপুলে নিয়ে খাব কি?

সাহেব বললে—কোনো কথা শুনব না। তোকে নীল চাষ করতেই হবে। চাষীটি বলল—না, তা হবে না। এই কথা শুনেই কুঠিয়াল সাহেব চাবুক দিয়ে মারলেন তার পিঠে এক ঘা। পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। তবুও লোকটি রাজী হলো না দেখে, সাহেব রাগে ক্ষেপে গিয়ে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগলো তাকে. শেষে লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেল। তবুও সাহেবের রাগ পড়লো না। তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। এরকম অত্যাচার তখন যেখানে সেখানে ঘটছে।

ইংরেজদের এই নিষ্ঠুর অত্যাচারে সবাই ছি ছি করতে লাগলো। এমন কি কয়েকজন ইংরেজ পর্যন্ত এর নিন্দা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পাদ্রী লং সাহেব। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁকেও কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

সমস্ত দেশের লোক ইংরেজ জাতিকে ধিক্কার দিতে লাগলো। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো ছড়াগান—


নীলকরের
অত্যাচার

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'লো, লঙের হ'লো কারাগার॥"

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ভয়ও পেয়েছিল তারা। ভারতবাসীরা যদি বারবার এভাবে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের এদেশে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এই ভেবে তারা ভারতবাসীকে শাসন আর শোষণে জর্জরিত করতে লাগলো। আইন করে ভারতবাসীদের উপর কর চাপানো হলো।

এর পরেই তাদের লক্ষ্য হল একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এদিকে দৃষ্টি রেখেই দেশের শিক্ষিত লোকদের ভালো ভালো চাকরি দেওয়া হলো। ধনী লোকদের বড়ো বড়ো খেতাব দিয়ে তারা হাত করে ফেললো। অতএব কে আর প্রতিবাদ করবে? তাই ইংরেজরা ইচ্ছেমত দেশের সাধারণ লোকের উপর শাসন আর শোষণ চালাতে লাগলো।

এর ফলে দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। যে ভারতবাসী দুঃখ কাকে বলে জানতো না, সেই ভারতবাসী একমুঠো অন্নের জন্যে হাহাকার করে পথে পথে ঘুরতে লাগলো। দলে দলে মানুষ অনাহারে নানা রকম কুখাদ্য খেয়ে রোগে ভুগে মরতে লাগলো।

মানুষ পেটের জ্বালায় মরিয়া হয়ে উঠলো। সেই সময় জমির মালিক ছিল চাষী। তারা জমি চাষ করে সংসার চালাতো। ইংরেজ চায় টাকা, তারা বড়ো লোকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জমিগুলোকে তাদের ভোগদখলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিল। ফলে জমির মালিক হলো বড়ো লোকেরা। যে সব জমি অবশিষ্ট রইলো, চাষীদের উপর হুকুম হলো,—সেই জমিতে নীল চাষ করবার।

যারা নীল চাষ করতে রাজী না হতো, নীলকররা তাদের বেঁধে মারতো, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচার করতো। তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিত।

শেষে একদিন অবস্থা চরমে উঠলো। একদিকে অনাহারের জ্বালা,

অন্যদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা নীলকর সাহেবদের কুঠিতে চড়াও হয়ে তাদের খুন জখম করতে লাগলো।

নিরস্ত্র জনসাধারণ সশস্ত্র সাহেবদের উপর দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে অনেকে প্রাণ দিল। তবুও তারা দমল না। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় কতক্ষণ আর শক্তিশালী ইংরেজদের সঙ্গে পারা যায়? তবু এই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সেদিন যদি ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র থাকতো তাহলে ইংরেজদের সেদিন মাথা নত করে এ দেশ থেকে চলে যেতে হতো।

নীলবিদ্রোহ দমন হলো বটে, কিন্তু ভারতবাসী ভুলতে পারলো না সাহেবদের এই অত্যাচারের কথা। কিভাবে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো যায়, তারই সুযোগ খুঁজতে লাগলো ভারতবাসীরা।

প্রশ্ন

১। দেশের ধনী এবং শিক্ষিত লোকদের কিভাবে হাত করেছিল সাহেবরা?
২। কোন্ ইংরেজ নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন?
৩। নীলকরদের অত্যাচার ও নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।



জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা

ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত চাষী, মজুর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুঝতে পারলো পরাধীনতার কত জ্বালা। সবাই পরামর্শ করতে লাগলো কিভাবে ইংরেজদের তাড়াবে। কি করে পরাধীন ভারত স্বাধীন হবে।

সেই সময় বোম্বাইয়ের নেতা দাদাভাই নওরোজী ছিলেন ইংলণ্ডে। তিনি সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করলেন একটি দল। নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'। ইনিই প্রথমে ঘোষণা করলেন যে, স্বাধীনতা ভারতের একমাত্র লক্ষ্য। বাংলার মনীষী সুরেন্দ্রনাথ যোগ দিলেন নওরোজীর সঙ্গে। এঁরা ভারতের জনমত কাগজে ছেপে প্রচার করতে লাগলেন। দেশের বহু গণ্যমান্য লোক এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগলো। ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেল। লর্ড লিটন ছাপাখানার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কাগজ ছাপা বন্ধ করে দিল।

লিটন সাহেব কিছুদিন পর স্বদেশে ফিরে গেলে তার পরিবর্তে লর্ড রিপন এসে ভারতবাসীকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলেন। ছাপাখানার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হলো। শিক্ষা প্রচারের জন্যে তৈরী করা হলো শিক্ষা কমিশন। মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা চালু করা হলো।

লর্ড রিপনের এই সব সুবন্দোবস্তের ফলে ভারতীয়রা কিছুটা শান্তি পেলো। লর্ড রিপনের আইন মন্ত্রী ইলবার্ট ছিলেন বেশ বিচক্ষণ লোক। তিনি বললেন, একটা আইন পাস করা হোক, এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকগণ ইংরেজদের বিচার করতে

পারবেন। দোষ প্রমাণ হলে দণ্ড বিধানও করতে পারবেন ভারতীয় বিচারগণ।

এই প্রস্তাব শুনে ইংরেজরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হলো। তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে আন্দোলন শুরু করলো। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাহেবদের আন্দোলনের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে একটি সর্বভারতীয় তহবিল গঠন করলেন। এছাড়া 'ইণ্ডিয়ান কন্‌ফারেন্স' নামে একটি সমিতি স্থাপন করে, আইনটি পাশ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।


রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

অবশেষে ইলবার্ট বিলের একটু পরিবর্তন হলো। স্থির হলো ভারতীয় বিচারকগণ ইংরেজদেরও বিচার করতে পারবে, কিন্তু ইংরেজ জুরির সাহায্য ছাড়া কোনো শাস্তি দিতে পারবেন না। এইভাবে সংশোধন করে ইলবার্ট আইন পাশ হলো।


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এর ফলে ভারতবাসী কিছুটা শান্ত হলো বটে, কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তাদের মনে কাঁটার মতো গেঁথে রইলো। আলোচনা সভা, প্রচার পত্র প্রভৃতির মাধ্যমে দেশবাসী একতাবদ্ধ হতে লাগলো।

বাংলার আর একজন বিশিষ্ট নেতা ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বোম্বাইয়ে ব্যারিস্টারি করতেন। তিনিও এগিয়ে এলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। তাঁরা বোম্বাইয়ে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" নামে একটি দল গঠন করলেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে এই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হলো। এতে সভাপতিত্ব করলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রথম এই দলের সৃষ্টি হলো। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ এতে যোগ দেন নি। পরে তিনি তাঁর দলসহ যোগ দিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে। ধীরে ধীরে এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো।

প্রশ্ন

১। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

২। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম কি?

৩। প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয় কত সালে, কোথায়?

৪। প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন?



বিপ্লবের সূচনা

বোম্বাই শহরের কাছাকাছি পুণা নামে একটা জায়গা। এখানে একটা গোপন স্থানে মিলিত হয়েছে কয়েকজন মারাঠা যুবক। এই গুপ্ত সমিতির প্রধান হলেন মারাঠা বীর ঠাকুরসাহেব। তিনি সমিতির যুবকদের দীক্ষা দিলেন অগ্নিমন্ত্রে! বললেন—ভাইসব, যারা আমাদের দেশে নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। বিদেশীদের বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা ভীরু বা দুর্বল নই। সমিতির সকলেই মেনে নিলেন তাঁর কথা। প্রস্তুত হলেন সবাই অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে।

সেই সময় র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট নামে দুজন ইংরেজ কর্মচারী পুণায় খুব অত্যাচার শুরু করেছিল। একদিন সুযোগ বুঝে গুপ্ত সমিতি সদস্যরা হত্যা করলো তাদের। ইংরেজ সরকার অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগলো হত্যাকারীদের। দলে দলে যুবকদের ধরে এনে চাবুক মারতে লাগলো তারা। অবশেষে গণেশ চাপেকার, মহাদেব চাপেকার নামে মারাঠী দুই ভাইকে হত্যাকারী সন্দেহে প্রাণদণ্ড দিল ইংরেজ সরকার।

কিন্তু এখানেই এর শেষ হলো না। এগিয়ে এলেন আর একজন মারাঠা-নেতা। সমস্ত মারাঠা জাতিকে একত্র করে তিনি বললেন—বর্বর ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনে কোনো ফল হবে না। এর জন্য চাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এ ছাড়া ভারত স্বাধীন হবে না।

এই মারাঠা নেতার নাম বাল গঙ্গাধর তিলক। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি নামে একটি জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন এই দেশপ্রেমিক। পরাধীনতার যে কি জ্বালা, তিনি ছেলেবেলা থেকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী হয়েও অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির মায়া ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন দেশপ্রেমের মন্ত্র। তিনি 'কেশরী' আর 'মারাঠা' নামে দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারলো না। কারাগারে আটক করে রাখা হলো তাঁকে। অনেক নির্যাতন চালানো হলো তাঁর উপর। তবু তিনি তাঁর কর্তব্য পথ থেকে সরে এলেন না। বিপ্লব আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠা জাতির মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করলেন। ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি উৎসবের মাধ্যমে সারা ভারতে জাতীয়তাবাদের নব প্রেরণা আনলেন এই সর্বজনমান্য নেতা। এইজন্য আজও ভারতবাসী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

প্রশ্ন

১। গুপ্ত সমিতি কোথায় স্থাপিত হয়েছিল এবং সমিতির নেতা কে ?
২। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যার জন্যে কাদের দণ্ড দেওয়া হয়েছিল ?
৩। বাল গঙ্গাধর তিলক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।



বীর সন্ন্যাসী

উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে এসেছিল স্বর্ণযুগ। পরাধীন ভারতবাসীর কাতর ক্রন্দনে বুঝি সেই সময় করুণাময় ভগবানের আসন টলেছিল। তাই দিকে দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক একজন যুগপুরুষ।

সে যুগে বাঙালী ছিল ভারতের বিস্ময়, পৃথিবীর বিস্ময়। ধর্মে, সাহিত্যে, কাব্যে, রাজনীতিতে, সমাজসংস্কারে, শিক্ষা বিস্তারে, বিজ্ঞানে বাঙালী তখন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

এই সময় কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন একজন কর্মযোগী মহাপুরুষ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উদার মানুষ। মাতা ভুবনেশ্বরী মহীয়সী নারী। ছেলেবেলায় এঁর নাম ছিল বিলে এবং ভালো নাম নরেন্দ্রনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করবার পরই এঁর বাবা পরলোক গমন করেন। সংসারে দেখা দেয় অভাব। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সেই সময় এঁকে একটি শিক্ষকতার চাকরি দেন। নানারকম অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তাঁর। এমন সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর হলো সাক্ষাৎ। এরই ফলস্বরূপ নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নাম হলো বিবেকানন্দ।

ভারতের বুকে তখন খ্রীষ্টান মিশনারীর দল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে

বেড়াচ্ছে। এর ফলে ভারতবাসীর মনে হিন্দুধর্মের উপর এসেছে অবিশ্বাস! এমন সময় আমেরিকার চিকাগো শহরে আরম্ভ হলো ধর্ম-মহাসভা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মপ্রচারকেরা উপস্থিত হলেন সেখানে। কিন্তু ভারতবাসীদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হলো না। হিন্দুধর্ম একটা ধর্মই নয়, এই কথাটাই বিদেশীরা জেনেছিল। তাই হিন্দু-ধর্মের প্রতি এই অপমানজনক আচরণে স্থির থাকতে পারলেন না নির্ভীক হৃদয় বিবেকানন্দ। ছুটে গেলেন চিকাগোতে বিনা আমন্ত্রণে। তার পর বহু কষ্ট সহ্য করে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় প্রবেশাধিকার পান।

এই বীর সন্ন্যাসী সেদিন চিকাগোর ধর্মমহাসভায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য। সারা বিশ্ব এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর কাছে মাথা নত করে। জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় তিনি যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দেশের অন্তর জয় করে ফিরে আসেন ভারতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে।

ভারতবাসীকে সম্বোধন করে তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন— "হে ভারত, ভুলিও না, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" মনে রেখো আমাদের এই জন্মভূমি আমাদের শৈশবের শয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

তিনি আরও বললেন—ভগবান মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই। তিনি আছেন মানুষের মধ্যে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

১৯০২ সালে এই মহাপুরুষ মহাপ্রয়াণ করেন। ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দান করে তিনি কলিকাতার নিকটে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করে গেলেন। তাঁর অমর আত্মা রামকৃষ্ণ মিশনের

স্বামীজীদের মাধ্যমে আজও ভারতকে উদ্দীপ্ত করছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশন।

প্রশ্ন

১। বিবেকানন্দের পিতা ও মাতার নাম কি?

২। তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

৩। তাঁর প্রধানা শিষ্যার নাম কি?

৪। কত সালে ইনি মহাপ্রয়াণ করেন?

৫। বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।

৬। বিবেকানন্দের বাল্যকালের নাম কি?

৭। বিবেকানন্দ বাল্যকালে কোথায় শিক্ষা লাভ করেন।

৮। বিবেকানন্দ কোন্ ধর্মসভায় বক্তৃতা করে বিখ্যাত হয়েছেন?

৯। বিবেকানন্দের বাণী কি?

১০। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন?



বিদ্রোহী বাংলা

অন্ধকার রাত্রি, নির্জন পথ, কেউ কোথাও নেই। সেই অন্ধকারে দুটি তরুণ রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছে।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে চললো, ওরাও অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ দূরে পথের ওপর একটা আলো দেখতে পাওয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে নিজেদের প্রস্তুত করে নিল ওরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো সেই আলোটা, কাছে—আরও কাছে—আরও কাছে! তরুণদের মুখে শোনা গেল "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড শব্দ। চুরমার হয়ে গেল একটা ফিটন্ গাড়ী আর আর্তনাদে ভরে গেল জায়গাটা।

কিন্তু একি! নারী কণ্ঠে আর্তনাদ উঠল কেন? তবে কি যার প্রতীক্ষায় ওরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে বাংলাদেশ থেকে এই বিহারে ছুটে এসেছে, তাকে শেষ করতে পারলো না! ভাববার সময় নেই, এখুনি পালাতে হবে, তা না হলে ধরা পড়বে! বিদ্যুতের মত পাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওরা পালালো।

বাংলায় তখন বিপ্লব আন্দোলন পুরোদামে চল্‌ছে। অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাংলার বিপ্লব দমন করতে চালাতে লাগলেন অবাধ অত্যাচার। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিপ্লবী নেতারা স্থির করলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। ভার পড়লো এই দুজন তরুণ বিপ্লবীর উপর। কিন্তু হঠাৎ কিংসফোর্ড বদলী হয়ে গেলেন

মজঃফরপুরে। তরুণ বিপ্লবীরা প্রতিশোধ নিতে বাংলা থেকে ছুটে এলো মজঃফরপুর। ঠিক সময়ে তারা আক্রমণ করলো, বোমার আঘাতে চুরমার করে দিল ফিটনগাড়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন দুজন ইংরেজ মহিলা, নিহত হলেন তাঁরা। এই দুই তরুণ বিপ্লবীদের একজন হলেন ক্ষুদিরাম বসু, আর একজন প্রফুল্ল চাকী।

ওয়াইনি স্টেশনে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম, বিচারে তাঁর ফাঁসি হলো। হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করলেন মেদিনীপুরের গৌরব, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। গ্রামের বাউল গেয়ে উঠলো—"একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি।"

কিন্তু প্রফুল্ল চাকীকে জীবন্ত ধরতে পারল না ইংরেজ সরকার। পুলিশ এগিয়ে আসতেই, রিভলবার হাতে তিনি গর্জন করে উঠলেন, পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। উপায় না দেখে তিনি রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন, মৃত্যুর সময় তাঁর মুখথেকে ধ্বনিত হলো "বন্দে মাতরম" ধ্বনি। বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ এই দুই তরুণ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন।

প্রশ্ন

১। ক্ষুদিরামের জন্মস্থান কোথায়?

২। কিংসফোর্ডকে কারা, কেন হত্যা করতে চেয়েছিল?

৩। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর শেষ পর্যন্ত কি হলো?



শ্রীঅরবিন্দ

ইংরেজ সরকারের পাষাণ কারার অন্তরালে বসে গভীর চিন্তায়-মগ্ন হয়ে আছেন ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন বাঙালী। চোখে-মুখে তাঁর বিপ্লবের আগুন। কপালে চিন্তার রেখা দেখে মনে হয়, তিনি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

তিনি চিন্তা করছেন তাঁর জন্মভূমি বাংলার কথা। চিন্তা করছেন ভারতের কথা। কেমন করে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দেশ আবার স্বাধীন হবে। কি উপায়ে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো যাবে।

দিন-রাত্রি নির্জন কারার অন্তরালে বসেও ভুলতে পারে না তাঁর জন্মভূমির পরাধীনতার কথা। একে একে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ফেলে-আসা জীবনের ঘটনাগুলি।

বাংলার রাজধানী কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। বাড়ীর সকলেই শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। তাই তাঁকে মাত্র সাত বছর বয়সেই ইংলণ্ডে নিয়ে গেলেন তাঁর অভিভাবকরা।

ইংলণ্ডেই তিনি ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলেন। তারপর তিনি তাঁর মাতৃভূমির আকর্ষণে ফিরে এলেন ভারতের বুকে।

সুদূর ইংলণ্ডে থেকেও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন

পরাধীন ভারতের দুঃখদুর্দশা। তাই তিনি ইংরেজ সরকারের সম্মানীয় তথা লোভনীয় চাকরি হাসিমুখে ত্যাগ করলেন।

তিনি চিন্তা করলেন, যারা আমাদের সোনার ভারতকে পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে, যারা শাসনে আর শোষণে ভারতবাসীকে জর্জরিত করছে, তাদের দেওয়া চাকরি গ্রহণ করে রাজভোগ খাবার চেয়ে ভিক্ষা করাও অনেক ভালো।

এই কথা চিন্তা করে তিনি ভারতে এসে বরোদা কলেজে সামান্য অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু শান্তি পেলেন না তিনি। পরাধীন দেশের কথা চিন্তা করে ফিরে এলেন বাংলার বুকে। বাংলায় তখন চলেছে আন্দোলনের পর আন্দোলন, প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ —চলেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি। লর্ড কার্জনের অন্যায় অত্যাচারে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে। তার প্রতিবাদে শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন।

সেই চরম লগ্নে তিনি ফিরে এলেন কলিকাতায়। ছোট ভাইটির সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। অবশেষে স্থির করলেন যে, ইংরেজকে এ দেশ থেকে মেরে তাড়াতে হবে। তাই বিপ্লবী দলকে শক্তিশালী করতে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন।

গোপনে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে লাগলেন তাঁরা। নিজেরা বোমা তৈরী করে, ইংরেজ ভক্ত ভারতীয় আর ইংরেজদের হত্যা করতে লাগলেন তাঁরা। বাংলার তরুণদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন এঁদের কাছে।

ইংরেজ সরকার সংবাদ পেলো এই গুপ্ত আন্দোলনের। চারদিকে ইংরেজের গুপ্তচর নিযুক্ত হলো এই দলের নেতাদের ধরবার জন্যে। অনেক চেষ্টার পর ধরা পড়লেন তাঁরা।

আলিপুরের বিচারশালায় বিচার শুরু হলো তাঁদের। পরবর্তীকালে ভারতের জনবরেণ্য নেতা ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতিত্বে ইনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু ছোট ভাইটির হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এই সব চিন্তা করতে করতে তাঁর চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমে এসেছিল। এমন সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন চারদিকে যেন আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিরাট পুরুষ। জ্যোতির্ময় সেই মূর্তি, তাঁর হাতে তুলে দিলেন একখানি গীতা।

তন্দ্রা কেটে গেল তাঁর। মনের গতির মোড় ফিরল অন্য দিকে। মুক্তিলাভ করে অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি। যোগ সাধনায় কাটতে লাগলো তাঁর দিন। অবশেষে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করে যোগ সাধনার মাধ্যমে বৃহত্তর সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি।

ইনিই আমাদের বাংলার গৌরব শ্রীঅরবিন্দ। এঁর ছোট ভাইয়ের নাম বারীন ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ অনেক বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে Life Divine বইখানি দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছে। এই বইখানির বঙ্গানুবাদ 'দিব্য জীবন'। ইনি শেষ জীবনে ঋষি অরবিন্দ নামে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন। ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই ১৫ই আগষ্ট তারিখেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কি এক অজ্ঞেয় রহস্য যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি—অনেক কালের ব্যবধানে হলেও একই দিনে এসে মিলিত হলো।

প্রশ্ন

১। অরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।
২। অরবিন্দ ইংলণ্ডে কি পরীক্ষা দিয়েছিলেন ?
৩। আলিপুর বোমার মামলায় কে ব্যারিস্টার ছিলেন ?
৪। অরবিন্দ রচিত বিখ্যাত বইখানির নাম কি ?



বুড়িবালামের তীরে

বালেশ্বর জেলার কোপতিপোদা গ্রামের কাছে বুড়িবালামের নির্জন তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি বাঙালী যুবক। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু। চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তিনি যেন কিসের প্রতীক্ষা করছেন।

সহসা দূরে কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—কারা যেন এদিকে আসছে, সাবধান হও। দূরে দেখা গেল একদল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছাকাছি এসে গেল পুলিশদল।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। তবু সামান্য কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র সম্বল করে তাঁরা যুঝে চললেন।

বহু পুলিশ হতাহত হলো তাঁদের গুলিবর্ষণে। কিন্তু হঠাৎ বিপক্ষ দলের একটি গুলির আঘাতে আহত হলেন নেতা। তাঁর সঙ্গীরা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সেদিন যে বীর সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় সে কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই বীর বাঙালীর নাম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বাঘা যতীন' নামেই ইনি সর্বাধিক পরিচিত।

বাংলা দেশের কুষ্টিয়া শহরের কাছে কয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছেলেবেলা

থেকেই ইনি দুরন্ত এবং নির্ভীক। একবার তিনি শুধু ছুরি হাতে একটি বাঘ মেরেছিলেন। সেই থেকেই তাঁর নাম 'বাঘা যতীন'।

প্রথম জীবনে ইনি সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরাধীন ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্যে তিনি যোগ দেন গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা কানাইলাল এবং বারীন ঘোষ রাজনৈতিক-মঞ্চ থেকে দূরে সরে গেলে, তিনি বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এর পর যতীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জাপান ও জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ইংরেজদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর তিনি কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বর শহরের কিছু দূরে কোপতিপোদার বুড়িবালাম নদীতীরে প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশদল ছুটে আসে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে।

যতীন্দ্রনাথ আজ আর ইহজগতে নেই। তাঁর দেশপ্রেম এমনই অবিচল ছিল যে গুরুতর আহত অবস্থায় তৃষ্ণার্ত হয়েও অত্যাচারী বিদেশীর হাতে জল খেতে ঘৃণাবোধ করেন। ঐ অবস্থায় অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। সেই বীর শহীদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে বালেশ্বরের সেই রক্তক্ষরা বুড়িবালামের তীর স্বাধীন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। বুড়িবালাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?

২। যতীন্দ্রনাথকে 'বাঘা যতীন' বলা হয় কেন?

৩। যতীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কোথায় এবং তাঁর পিতার নাম কি?

৪। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।



জাতীয় আন্দোলনের নতুন অধ্যায়

গুজরাটের রাজকোটে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভারত রাষ্ট্রের জনক, বিশ্বের অন্যতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী। ব্যারিস্টারি পাস করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনব্যবসা করতে যান। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর সেখানকার সরকার নানারকম অবিচার ও অত্যাচার করতো। ভারতীয়দের এই অপমান ও নিপীড়ন তাঁর মনে রেখাপাত করলো, তিনি আইনব্যবসার কথা ভুলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতে শুরু করলেন আন্দোলন। তিনি ছিলেন সত্য ও অহিংসার পূজারী। তাই সেদিন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন, তা ছিল সত্যের এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর এই সংগ্রামকে বলা হয় "সত্যাগ্রহ আন্দোলন"। মানুষ সত্যপথ গ্রহণ করবে এবং সত্যের প্রতি আগ্রহ নিয়ে সংগ্রাম করবে; এর পিছনে কোনো হিংসার ভাব থাকবে না, শত্রুর কাছ থেকে আঘাত পেলেও শত্রুকে আঘাত করবে না।—এই ছিল গান্ধীজীর মত এবং পথ।

এই নীতিতে আন্দোলন ক'রে তিনি সেখানকার সরকারকে ভারতীয়দের অধিকাংশ দাবি মানতে বাধ্য করালেন। ভারতবাসী অবাক হয়ে দেখলো তাঁর আন্দোলনের নতুন পথ। এবার গান্ধীজী ফিরে এলেন ভারতের বুকে। ভারত জননীর পরাধীনতার কালিমা

মুছিয়ে দিতে যোগ দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। তিনি ভারতবাসীকে দিলেন নতুন পথের সন্ধান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শুরু হলো নতুন অধ্যায়। সশস্ত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি আরম্ভ করলেন 'অসহযোগ আন্দোলন'।

এই আন্দোলনের অর্থ অহিংস উপায়ে আন্দোলন করা, হিংসাত্মক কাজ না করা, সব রকম বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা, চরকায় সুতা কাটা, আর বিদেশী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করা। তাঁর আন্দোলনের নতুন পথ দেখে ও তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ইংরেজ সরকার হাসলো। তার কারণ তিনি ছিলেন বিলাসবর্জিত সন্ন্যাসী। পরনে ছিল তাঁর হাতে বোনা হাঁটু পর্যন্ত মোটা কাপড়, আর গায়ে খদ্দরের চাদর। কিন্তু এই অর্ধ নগ্ন সন্ন্যাসী যেদিন বজ্রগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানালেন জাতীয় পতাকাতলে ভারতের নরনারীকে, সেদিন শক্তিমান ইংরেজ সরকার ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল তাঁর আন্দোলনে। ছাত্ররা সরকারী বিদ্যালয় ছেড়ে দিল, উকিল-ব্যারিস্টার আইন-ব্যবসা ছেড়ে এগিয়ে এলো আন্দোলনে যোগ দিতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর মতিলাল নেহেরু হাজার টাকার আয় ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন আন্দোলনে। ভারতের নরনারী জাতিভেদ ভুল গিয়ে সমবেত হলো তাঁর আহ্বানে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বোস প্রভৃতি দেশ-প্রেমিকগণ যোগ দিলেন এই আন্দোলনে।



আবুল কালাম আজাদ

এই সময় একজন মুসলমান নেতা যোগ দিলেন আন্দোলনে। তাঁর নাম আবুল কালাম আজাদ। এঁর সঙ্গে আরও অনেক

মুসলমান নেতা এসে যোগ দিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। অসহযোগ আন্দোলন আরও শক্তিশালী হলো।

একটার পর একটা আন্দোলন চলতে লাগলো। সরকার এই আন্দোলন দমন করতে সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। কিন্তু ভারতবাসী ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল না, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো।

প্রশ্ন

১। মহাত্মা গান্ধী কে ছিলেন?

২। সত্যাগ্রহ কথাটির অর্থ লিখ।

৩। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কাকে বলে? এই আন্দোলন কে এবং কোথায় আরম্ভ করেছিলেন?

৪। অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ কি?

৫। মহাত্মা গান্ধী কোন্ সময় ভারতে ফিরে এলেন?

৬। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে কোন্ কোন্ ভারতীয় নেতা এগিয়ে এসেছিলেন?

জালিয়ানওয়ালাবাগ

জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। এই জায়গাটা হচ্ছে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে। এখানে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে রামলীলা উৎসব উপলক্ষে মেলা বসতো।

যে বাগানটায় এই মেলা বসতো, তার নাম ছিল জালিয়ানওয়ালা-বাগ। এক বাগানটার তিন দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই বাগানের ভিতর নানারকম আমোদ-প্রমোদ, দোকান-পসার ইত্যাদি বসতো।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও মেলা বসেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার যুবক-যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আজকের মেলায় আবার কংগ্রেসের নেতারা এসেছেন, তাঁরা এখানে একটা মিটিং করবেন।

ইংরেজ সরকার 'রাউলাট আইন' নামে একটা আইন পাস করেছে, তারই প্রতিবাদে এই সভা ডাকা হয়েছে।

রাউলাট আইনটা কি জানো? মাদ্রাজ হাইকোর্টে একজন ইংরেজ জজ তাঁর নাম ছিল রাউলাট। তিনি ইংরেজ সরকারকে যুক্তি দিয়ে একটা আইন পাস করালেন যে, এই আইনের বলে যে কোনো ভারতবাসীকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কারারুদ্ধ করা যাবে। রাউলাট সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী এই আইন তৈরী হয়েছিল বলে এর নাম 'রাউলাট আইন' বা 'কালা কানুন'।

ভারতবাসী এই আইনের প্রতিবাদ জানালো। সারা ভারতে হরতাল পালিত হলো এবং তীব্র আন্দোলন শুরু হলো এই আইনের বিরুদ্ধে। রামলীলা উৎসব উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিবাদ সভা বসলো।

জেনারেল ও'ডায়ার নামে একজন ইংরেজ ছিলেন সেখানকার


জালিয়ানওয়ালাবাগ

সৈন্যদলের নেতা। তিনি তাঁর দলবল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। যাতে কেউ পালাতে না পারে সেজন্যে চারদিকে সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো। তিন দিকে পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মাত্র একটিই বেরোবার রাস্তা ছিল। সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দিলেন জেনারেল ডায়ার।

শান্ত নিরীহ নরনারী যখন একমনে সভায় বক্তৃতা শুনছে, এমন সময় সৈন্যদের গুলি চালাতে হুকুম দিলেন জেনারেল ডায়ার। আদেশ পেয়ে গর্জন করে উঠলো সৈন্যদের বন্দুকগুলো। আহতদের আর্তনাদে ভরে গেল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহর। নারী-পুরুষ নির্বিচারে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। ইংরেজেব এই বর্বর আক্রমণে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি রক্তে রাঙা হয়ে গেল। প্রায় পনের শত নিরস্ত্র অসহায় নরনারী প্রাণ দিল ইংরেজ সরকারের রোষানলে।

কিন্তু এতেও ভারত পিছিয়ে গেল না তার কর্তব্য পথ থেকে। ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হল প্রবলভাবে। ইংরেজের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো দেশবিদেশে। স্বাধীন সুসভ্য দেশের নরনারী ধিক্কার দিল ইংরেজ সরকারকে। ভারতের নেতারা নতুন উদ্যমে আন্দোলন চালাতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নব ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গীতিকবিতা রচনায় তিনি ছিলেন পৃথিবীর কবি-সমাজের অদ্বিতীয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটল ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাঁর কোমল হৃদয় হাহাকার করে উঠলো। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করলেন ইংরেজ সরকারের


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেওয়া 'নাইট' উপাধি। তাঁর এই ত্যাগে বিশ্বের জনগণ শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালে তাঁর কাছে। ব্রিটিশ সরকার চরম অপমানিত হলেন।

প্রশ্ন

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় অবস্থিত ?

২। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কত সালে হয়েছিল ?

৩। রাউলাট আইনটা কি ? কি জন্যে রাউলাট আইন নাম হয় ?

৪। নিরীহ জনসাধারণের উপর গুলি চালাবার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন ?

৫। রবীন্দ্রনাথ কি জন্যে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।



অসহযোগ আন্দোলন

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রামে, শহরে, হাটে-বাজারে ও পথেঘাটে আন্দোলনকারীরা বিলাতী জিনিস পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো। ইংরেজ সরকার তিরিশ হাজার ভারতবাসীকে কারারুদ্ধ করলো।

এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে কংগ্রেসের সভায় সারা ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধীজী শুরু করলেন অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ব্রিটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচার। আন্দোলনকারীদের ধরে এনে চাবুক মারতে লাগলো পুলিশ। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে তারা নির্মমভাবে লাঠি চালাতে লাগলো। পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহীরা হিংসার পথ গ্রহণ করলেন।

বিহারের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরীচৌরা নামে একটা গ্রাম আছে।

এখানেই অহিংস সত্যাগ্রহীরা হিংসার পথ গ্রহণ করলেন। তাঁরা থানা আক্রমণ করে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন, আর বাইশজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করলেন।

গান্ধীজী এতে মর্মাহত হলেন। অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলেন তিনি। ফলে এই আন্দোলনের তীব্রতা কমে গেল।

এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতারা একটা দল গঠন করলেন, তার নাম হলো স্বরাজ্য দল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি ইংলণ্ড যান এবং সেখানে ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে আসেন কলিকাতায়। আইন ব্যবসায়ে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলাটি তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই অসাধারণ কৃতিত্বে সেদিন শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন।

দেশবন্ধু তাঁর আইন-ব্যবসা ত্যাগ করে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর উপার্জিত প্রচুর অর্থ তিনি দেশের কাজে দান করে দিলেন। এমন কি দেশবাসীর জন্যে তিনি তাঁর বসত বাড়িটি পর্যন্ত দান করে গিয়েছেন। সেখানে স্থাপন করা হয়েছে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে তিনিই সর্বপ্রথম মেয়র হয়েছিলেন। অসাধারণ দেশপ্রেম, দানশীলতা এবং ত্যাগের জন্যে তিনি দেশবাসীর কাছে "দেশবন্ধু" আখ্যা লাভ করেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও সেই সময় উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে তিনিও প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে আইন ব্যবসা ত্যাগ করে

ভারতের জাতীয় পতাকাতলে এসে দাঁড়ালেন এই দেশভক্ত নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করলেন স্বরাজ্য দল। চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ডের পর যখন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দেন, সেই সময় ইনি স্বরাজ্য দলের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বিশ্বের অন্যতম স্বনামধন্য পুরুষ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। দেশবন্ধু এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আজ আর ইহজগতে নেই, কিন্তু তাঁদের দেশপ্রেম আর দেশবাসীর জন্য আত্মত্যাগ ভারতবাসীর কাছে তাঁদের চিরদিন অমর করে রাখবে।



মতিলাল নেহেরু

প্রশ্ন

১। কোন্ জায়গায় সত্যাগ্রহীরা হিংসার পথ গ্রহণ করেন ?

২। চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু বলা হয় কেন ?

৩। স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন কাঁরা ? তাঁদের নাম লিখ।

৪। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সম্বন্ধে কি জান ?



বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে এক নির্জন পরিবেশে গোপনে মিলিত হয়েছেন কয়েকজন বিপ্লবী। তাঁদের উদ্দেশ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। কারণ অস্ত্র না হলে সশস্ত্র ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। শিক্ষা দেওয়া যাবে না অত্যাচারী ইংরেজকে।

খুব গোপনে বৈঠক বসেছে। চারদিকে ইংরেজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সারাদেশ তোলপাড় করে তারা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে কংগ্রেস কর্মীদের। সে সময় ইংরেজ গভর্নমেন্ট কোনও কংগ্রেস কর্মীর সন্ধান পেলে তাকে ধরে এনে ফাঁসি দিত। কারও হতো দ্বীপান্তর অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস, আবার কাকেও নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হতো। জনসাধারণও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতো না। কংগ্রেস কর্মীদের সন্ধান পাবার আশায় গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিত তারা। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেউ এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতো না। বিপ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইংরেজ দেখলেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতেন।

একদিকে যেমন ভারতবাসীর বুকের রক্তে ভারতের মাটি ভিজিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে ইংরেজ সরকার অট্টহাসি হাসতো, অপরদিকে বিপ্লবীরা ইংরেজের রক্তে ভারতমাতার তর্পণ করতো। টেগার্ট, বার্জ, প্যাডি ও ডগলাস প্রভৃতি অত্যাচারী ইংরেজদের হত্যা করে বিপ্লবীরা প্রতিশোধ নিয়েছিল এর আগেই। আজও তারা গোপনে


চট্টগ্রাম
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

জড়ো হয়েছে ইংরেজ নিধনের পরামর্শ করতে। কিন্তু অস্ত্র কোথায়? অস্ত্র ছাড়া তো ওদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না।

অনেকক্ষণ ওদের মধ্যে পরামর্শ হলো। শেষে দলপতি বললেন—লুঠ করে নেব ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগার। সকলে মেনে নিল দলপতির সিদ্ধান্ত।

অন্ধকার রাত। রাতের অন্ধকারে ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে চলেছে বাংলা মায়ের দুরন্ত কতকগুলি সশস্ত্র ছেলে। ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে তারা এগিয়ে এলো অস্ত্রাগারের কাছে।

অস্ত্রাগারের সামনে সশস্ত্র সৈনিক সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার, নিস্তব্ধ, কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে কয়েকজন দৌড়ে এলো। বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে বাঘের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো পাহারাদার সেনাটির উপর। তার হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করলো ওরা। এগিয়ে এলো আরও পাহারাদার সৈন্য, তাদেরও ওরা কাবু করলো। তারপর অস্ত্রাগার থেকে যতটা সম্ভব অস্ত্র দখল করে ওরা আগুন ধরিয়ে দিল অস্ত্রাগারে। তারপর পালিয়ে গেলো সবাই। শেষ পর্যন্ত ওরা আশ্রয় নিল জালালাবাদ পাহাড়ে; কিন্তু দুদিন বাদে ইংরেজ বাহিনীও পৌঁছে গেল সেখানে। ঘিরে ফেললো জালালাবাদ পাহাড়।

উভয় পক্ষ সমানে গুলি চালাতে লাগলো। আহতের আর্তনাদে, গুলির শব্দে, আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ভরে উঠলো জালালাবাদ পাহাড়। কয়েকজন বিপ্লবী আহত হলো, তবুও তারা প্রাণপণে গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু অসংখ্য সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যের কাছে সামান্য কয়েকজন বিপ্লবী বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। শহীদের রক্তে লাল হয়ে উঠলো চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়।

গুপ্তচর খুঁজে বেড়াতে লাগলো এই বিপ্লবীদের। অবশেষে ধরা পড়লেন এই বিপ্লবী দলের নেতা সূর্য সেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড

হলো। এই বীর বাঙালী সূর্য সেন আজও বাঙালীর মনে সূর্যের মতো উজ্জ্বল্ হয়ে আছেন।

প্রথম জীবনে সূর্য সেন শিক্ষকতা করতেন, সেইজন্য তাঁকে সকলে 'মাস্টারদা' বলে ডাকতো। সংগঠন শক্তি আর চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল তাঁর অসাধারণ। 'মাস্টারদা' নামেই ইনি বেশী পরিচিত ছিলেন। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলা মায়ের এই দামাল ছেলে হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করলেন। ভারতবাসী কোনোদিন তাঁর কথা ভুলবে না।

প্রশ্ন

১। চট্টগ্রামে কোথায় বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল ?
২। সূর্য সেন কি নামে পরিচিত ছিলেন-এবং কেন ?
৩। বিচারে সূর্য সেনের কি হলো ?
৪। ইংরেজ সরকার কিভাবে অত্যাচার করতো ?
৫। কোন্ কোন্ অত্যাচারী ইংরেজকে বিপ্লবীরা হত্যা করেছিল ?



রক্তাক্ত পাহাড়তলী

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ সরকার চরমপন্থা অবলম্বন করলো। অত্যাচারে জর্জরিত করে তুললো সারা চট্টগ্রাম। বিপ্লবীরাও এর প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হলেন।

রাতের অন্ধকারে একটি গোপন জায়গায় জমায়েত হলেন বিপ্লবীরা। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পাহাড়তলীতে ইংরেজদের আড্ডাটা উড়িয়ে দিতে হবে। ইংরেজ সরকারের কর্মচারীদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে হবে দেশব্যাপী এই অত্যাচারের। দলপতি বললেন—তোমাদের মধ্যে কে এই দায়িত্ব নিতে চাও, সাহস করে এগিয়ে এসো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটি মেয়ে। সবাই অবাক হয়ে গেল তাঁকে দেখে। দলের নেতা জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি পারবে? মেয়েটি বললেন,—নিশ্চয়ই পারবো। যারা আমাদের সোনার বাংলাকে শাসন-শোষণে শ্মশান করে দিয়েছে, তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে নিশ্চয়ই পারবো আমি। আসুক যত বাধা আর বিপদ, আমি প্রাণের ভয় করি না। আমার এই তুচ্ছ প্রাণ আমি দেশজননীর চরণতলে উৎসর্গ করছি। তাঁর এই তেজোদীপ্ত কথা শুনে তাঁর উপর ভার দেওয়া হলো পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবে হানা দেওয়ার।

গভীর রাতে পুরুষের বেশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে চললেন তিনি পাহাড়তলীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে তাঁর আরও কয়েকজন বিপ্লবী। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁরা অতি সন্তর্পণে এসে পৌঁছলেন নির্দেশিত স্থানে। ইংরেজরা কিন্তু আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিল। তাই বিপ্লবী দল আক্রমণ করতেই চারদিক থেকে বেরিয়ে এলো সশস্ত্র ইংরেজ।

শুরু হলো খণ্ডযুদ্ধ। বন্দুক আর রিভলবারের গুলিতে প্রাণ দিল উভয় পক্ষের অনেকেই। পাহাড়তলীর মাটি লাল হয়ে উঠলো মানুষের তাজা রক্তে। আহতদের আর্তনাদে ভরে গেলো জায়গাটা।

দলের নেতা সেই মেয়েটি দুহাতে গুলি চালিয়ে প্রাণ নিল অনেক ইংরেজের। কিন্তু অসংখ্য সশস্ত্র ইংরেজের কাছে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না বিপ্লবীরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো তারা। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় দলনেত্রীকে বন্দী করতে পারলো না ইংরেজ সরকার। বিষপান করে আত্মহত্যা করলেন তিনি।

এই বিপ্লবী নারীর নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই বীরাঙ্গনা। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে এই বীর রমণী এক নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গেছেন বাংলার নারী সমাজকে।

প্রশ্ন

১। প্রীতিলতার জন্মস্থান কোথায়?

২। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়?

৩। পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।



ওরা তিনজন

ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল। সকাল থেকেই হাসপাতালের চারপাশে সশস্ত্র পাহারা বসেছে। নার্স ও ডাক্তারদের মধ্যে একটা সচকিত ভাব।

পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ বার্ড রয়েছেন হাসপাতালে। তাঁকে দেখতে আসছে বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ এফ. জে. লোম্যান, আর ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ হডসন। তাই চারদিকে এত পুলিশ পাহারা।

ওরা এসে পৌঁছাবার আগেই একজন বাঙালী যুবক সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে পড়লো হাসপাতালে। রিভলবার হাতে নিয়ে সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে রইলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল লোম্যান, আর হডসন। সঙ্গে পিস্তলধারী দেহরক্ষীর দল।

বার্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে আসছিলেন মিঃ লোম্যান, আর হডসন। এমন সময় ঘটলো একটা ঘটনা। যেই তাঁরা সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, সেই মুহূর্তে সিঁড়ির পাশ থেকে বেরিয়ে এল যুবকটি। লোম্যান আর হডসনকে লক্ষ্য করে চালালো গুলি। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। কে যেন কাতর আর্তনাদ করে পড়ে গেল সিঁড়ির উপর। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় মিঃ লোম্যান, আর

হডসন সিঁড়ির ওপর পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই হতভম্ব হয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো। ডাক্তাররা প্রাণপণে চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলো না মিঃ লোম্যান, আর হডসনকে।

চারদিকে পুলিশ তখন হত্যাকারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। নির্মমভাবে অত্যাচার করছে মিট্‌ফোর্ড বিদ্যালয়ের উপর। অবশেষে নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একজন বললো—হত্যাকারীর নাম বিনয় বসু। বাড়ি বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাউথভোগ গ্রামে। বাবার নাম রেবতীমোহন বসু।

তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে লাগলো ইংরেজ গভর্নমেণ্ট। সংবাদপত্রে হত্যাকারীর সন্ধানের জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কেউ পারলো না বিনয়ের সন্ধান দিতে।

বিনয় ইতিমধ্যে পালিয়ে এসেছে কলিকাতায়। সেখানেই লুকিয়ে রাখা হলো বিনয়কে।

একটি একটি করে যত দিন যেতে লাগলো ইংরেজ সরকারের অত্যাচারও ততো বেড়ে চললো। বিপ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। সময় সুযোগ বুঝে তাঁরাও এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিতে লাগলেন। ইংরেজ তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সারা বাংলায় বিপ্লবীরা ছড়িয়ে পড়েছে। কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের আগুন। কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না তাদের। ইংরেজ সরকার উপায়ান্তর না দেখে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে ; নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী কেউ তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

এ সময় সুধীরচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন তরুণ যোগ দিল বিপ্লবীদের সঙ্গে। এঁর ডাক নাম বাদল। এই নামেই এই তরুণ বীর বিপ্লবী জনগণের কাছে পরিচিত। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাঁওয়ে বাড়ি। বাবার নাম অবনীকুমার গুপ্ত।

বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাদল বিপ্লবের পথে এগিয়ে এলেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি পরিচিত হলেন দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে।

নির্ভীক চিত্তে এই তরুণ বিপ্লবী তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর আদেশ হলো টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ইংরেজদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। বাদল রাতের অন্ধকারে পুলিশ প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ সুসম্পন্ন করলেন। পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। চারদিকে ইংরেজ সরকারের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তিনি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করলেন।

ঢাকা শহরের রাজপথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল একটি যুবক। হঠাৎ কিসের একটা গোলমাল শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখলো —কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা সত্যাগ্রহ করছে। তাদের মাঝে দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ হডসন। সাইকেল থেকে নেমে যুবকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। হডসন পুলিশদলকে লাঠিচার্জ করতে হুকুম দিতেই এগিয়ে এলো ছেলেটি, বাধা দিল পুলিশদলকে। হডসন ভয় দেখালো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তখন হডসন তার দলবল নিয়ে ফিরে গেল।


বাদল গুপ্ত

হডসন কিন্তু ভুলতে পারলো না এই অপমানের কথা। পুলিশ সন্ধান করতে লাগলো এই ছেলেটির। অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল যুবকটির নাম দীনেশ গুপ্ত। বাড়ি বিক্রমপুরে অন্তর্গত যশোলঙ্গ গ্রামে। বাবার নাম সতীশচন্দ্র গুপ্ত।

দীনেশ তাঁর উদার চরিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবী নেতাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন বিপ্লবের পথে। এমন সময় বিনয় হত্যা করলো মিঃ লোম্যান, আর হডসনকে। তখন ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে বিপ্লবী নেতারা দীনেশ, আর বাদলকে পাঠিয়ে দিলেন কলিকাতায়। বিনয়, বাদল আর দীনেশ তিনজনে একসঙ্গে মিলিত হলো।



দীনেশ

ঢাকা থেকে লোম্যান, আর হডসনের হত্যাকারী বিনয় বসু এবং আরও অনেক বিপ্লবী কলিকাতায় চলে এসেছে এই সংবাদ পেয়ে। চার্লস টেগার্ট কলিকাতায় আরম্ভ করলেন নির্মম অত্যাচার। অপরদিকে কারাগারের বন্দী নেতাদের উপর নির্যাতনের আদেশ দিলেন কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন।

এই সময় বিনয়ের উপর আদেশ হলো কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। বিনয় সানন্দে রাজী হলেন। নেতারা স্থির করলেন সঙ্গে থাকবেন বাদল. আর দীদেশ।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বেলা বারোটার সময় একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে। গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো বিনয়, বাদল আর দীনেশ। গাড়ী থেকে নেমে সোজা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দোতলায় উঠে এলো ওরা তিনজন। সকলে তখন যে যার কাজে ব্যস্ত। তাই কেউ ওদের দেখেও দেখলো না। কর্নেল সিম্পসন তখন একমনে ফাইল দেখছিলেন তাঁর ঘরে। ওরা ঢুকে পড়লো সেই ঘরে, তারপর সিম্পসনকে কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে, তিনজনেই একসঙ্গে চালালো গুলি। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো কর্নেল সিম্পসনের প্রাণহীন দেহটা।

গুলির শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলো, সশস্ত্র পুলিশদল ছুটে

এলো। ওরা তিনজন যখন পালাবার উপক্রম করছিলেন, তখন চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশদল ফিরে ফেললো ওঁদের। একদিকে রাইফেলধারী পুলিশদল, অপর দিকে মৃত্যুঞ্জয়ী তিন বিপ্লবী। উভয় পক্ষে শুরু হলো গুলি বিনিময়। অনেকগুলো পুলিশ ওঁদের গুলিতে আহত হলো। টেগার্টের গুলিতে দীনেশের বাঁ হাত জখম হলো। তবু প্রাণপণে গুলি চালাতে লাগলেন এই তিনজন বীর বিপ্লবী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁদের গুলি ফুরিয়ে এলো। তিনজন পাশের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর বিনয়, আর দীনেশ নিজেদের গলায় গুলি করলেন, আর বাদল খেলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড। সঙ্গে সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন বাদল।

বিনয়, আর দীনশকে হাসপাতালে আনা হলো। অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এলো তাঁদের। বিনয় কিন্তু সুযোগ খুঁজতে লাগলেন আত্মহত্যা করার জন্যে। শেষে আহত জায়গাটার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে সেপ্‌টিক করে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিনয় বসু।

দীনেশের উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকায় তিনি আত্মহত্যার সুযোগ পেলেন না। তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো। তারপর শুরু হলো বিচার। বিচারে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হলো।

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই ভোর চারটের সময় তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসিমুখে তিনি নিজেই উঠে গেলেন ফাঁসির মঞ্চে! মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—বন্দেমাতরম্। মৃত্যু বরণ করলেন তিনি।

ওঁরা তিনজন আজ নেই। কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরে চিরদিন জেগে থাকবে তিনটি নাম—বিনয় —বাদল—দীনেশ। তাঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখার জন্য ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম দেওয়া হয়েছে—বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

প্রশ্ন

১। বিনয়ের জন্মস্থান কোথায় এবং বাবার নাম কি ?
২। লোম্যান এবং হডসন হত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। বাদলের অপর নাম কি ?
৪। বাদলের জন্মস্থান কোথায় ও বাবার নাম কি ?
৫। দীনেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকেছিলেন কেন ?
৮। বিনয়, বাদল ও দীনেশ কে কিভাবে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন ?



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে

বিপ্লব আন্দোলন তখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন চলছিল প্রবলভাবে। বাংলার বহু বরণীয় নেতা ভারতের জাতীয় পতাকাতলে এসে সমবেত হলেন।

এই সময় মেদিনীপুর জেলার একজন দেশভক্ত সন্তান এসে যোগ দিলেন এই আন্দোলনে। বিপ্লবী মেদিনীপুর আবার জেগে উঠলো নব চেতনায় এই নির্ভীক নেতাকে পেয়ে।

কোন দিন তিনি কারোর কাছে মাথা নত করেন না। এমন কি মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বলে গিয়েছিলেন—"ওরে দেখিস তোরা, আমার উঁচু মাথা যেন নীচু না হয়। আমি মরে গেলে আমার দেহটা তোরা বসিয়ে পোড়াবি।" তাই হলো, মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে এনে বসিয়ে দাহ করা হয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথিতে জন্মগ্রহণ করেন দেশমাতৃকার এই বীর সন্তান। মা-বাবা নাম রেখেছিল 'বীরেন্দ্র'—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তাঁর 'বীরেন্দ্র' নাম সার্থক করেছিলেন তিনি।

লেখাপড়ায় এবং চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অসাধারণ। ব্যারিস্টারি পাস করে আইন ব্যবসা শুরু করার পর যোগ দেন

স্বাধীনতা আন্দোলনে। দেশের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর প্রাণ কাঁদতো, তাই তাঁকে বলা হয় 'দেশপ্রাণ'। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনগণের মনে এসেছিল নবজাগরণ। তাঁকে দমন করতে অনেক চেষ্টা করেছিল বিদেশী শাসক। বহু নির্যাতনে জর্জরিত করেছিল তাঁকে, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একজন বরেণ্য নেতা ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মেজো ছেলে তিনি। তাঁর জন্ম কলিকাতায়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদী।



শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে এ সময় এগিয়ে এসেছিলেন আর একজন। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র বসু। বিশ্ববরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বড়ো ভাই তিনি।

ব্যারিস্টারি পাস করে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ব্যারিস্টার হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে টেনে নিয়ে এলো ভারতের জাতীয় পতাকা-তলে। ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি পড়লো তাঁর উপর। জেলে যেতে হলো তাঁকে। একবার নয়—বহুবার তাঁকে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। তবু তাঁর দেশপ্রেম একটুও কমেনি। কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস সদস্যদের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র। স্বাধীনতা লাভের তিন বছর পরে এই দেশভক্ত সন্তান পরলোক গমন করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব মহীয়সী মহিলা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন সরোজিনী নাইডু। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। পিতার নাম ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজী ভাষায় এঁর অসাধারণ

জ্ঞান ছিল। অল্প বয়সে ইংরেজী কবিতা লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা হয়ে আজীবন কংগ্রেসের সেবা করে গেছেন এই মহীয়সী মহিলা। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতার দ্বারা দেশের জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন তিনি। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। স্বাধীনতার পর তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের দু'বছর পরে এই মহীয়সী মহিলা পরলোক গমন করেন।



সরোজিনী নাইডু

এই সব মহান নেতা ও নেত্রীবৃন্দ সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন একটার পর একটা। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের কাছে মাথা নত করলো। ফলস্বরূপ 'ভারত শাসন' আইন পাস হলো। এই আইনের বলে ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে কংগ্রেস আটটি প্রদেশের শাসন-ভার গ্রহণ করলো।

এই সময় আরম্ভ হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্রিটিশ এই যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হয়ে ভারতবাসীর সাহায্য চাইলো এবং ভারতীয় সৈন্য ও অর্থ নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগালো ইংরেজ। কংগ্রেস দাবি করলো যে, যুদ্ধ জয় হলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু কোনো স্পষ্ট উত্তর দিল না। এর ফলে কংগ্রেস আটটি প্রদেশের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলো।

এই সময় মুসলিম লীগের অধিবেশন হলো লাহোরে। এই অধিবেশনে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহম্মদ আলী জিন্না। এরা দাবি করে বসলো, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হোক্।

এই দিন লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনেই সূচনা হলো পাকিস্তানের।

প্রশ্ন

১। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কে ছিলেন ?

২। বীরেন্দ্রনাথকে 'দেশপ্রাণ' বলা হয় কেন ?

৩। শ্যামাপ্রসাদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

৪। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বড়ো ভাইয়ের নাম কি ?

৫। শরৎচন্দ্র বসু কেন্দ্রীয় পরিষদের কে ছিলেন ?

৬। সরোজিনী নাইডুর জন্মস্থান কোথায় ?

৭। সরোজিনী নাইডুর মাতা-পিতার নাম কি ?

৮। কোন্ আইনের বলে ভারতে নির্বাচন হলো ?

৯। কোথাকার অধিবেশনে পাকিস্তানের সূচনা হয় এবং ঐ অধিবেশনের প্রধান নেতার নাম কি ?



নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনী

সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার লেখাপড়া শেষ করে তিনি বিলাতে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেওয়া সম্মানজনক চাকরির মোহ ত্যাগ ক'রে তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪১ সাল। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক অপরাধে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার চারদিকে পাহারা বসিয়ে রেখেছে, কারণ ইংরেজ এঁকে খুব ভয় করতো। অনেকবার কারাগারে পাঠিয়েছে, বহু নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে শায়েস্তা করতে পারেনি।

কিন্তু এত সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও একদিন তিনি ছদ্মবেশে ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আফগানিস্তান হয়ে পৌছলেন জার্মানির রাজধানী বার্লিনে। চারদিকে খোঁজ পড়লো। তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগলো ইংরেজ সরকার, কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। হঠাৎ রেডিওতে ভাষণ দিলেন সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে। ভারতবাসী তাঁর ভাষণ শুনে বিস্মিত হলেন। বার্লিন থেকে, হিটলারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি এলেন জাপানের রাজধানী টোকিওতে। এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন অন্যতম প্রবাসী নেতা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। একের পর এক দেশ দখল করে নিচ্ছে জার্মানী। জাপানও যোগ দিয়েছে জার্মানীর সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুর সহায়তায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' গঠনে মন দিলেন। যে সব ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাঁরা যোগ দিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে। মরণ পণ করে তাঁরা দেশ উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্র পরিচিত হলেন 'নেতাজী' নামে।

নেতাজী তাঁর বাহিনী নিয়ে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন 'স্বাধীন ভারত সরকার' (আজাদ হিন্দ হুকুমৎ)। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মন্ত্র হলো 'জয় হিন্দ' অর্থাৎ ভারতের জয়। তারা 'দিল্লী চলো' ধ্বনি দিতে দিতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো এবং মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ ক'রে আসামের অন্তর্গত কোহিমা পর্যন্ত এগিয়ে এলো। কিন্তু খাদ্যের অভাব ও ভীষণ বর্ষার জন্যে তারা আর এগিয়ে আসতে পারলো না। এই সময় জাপান মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলো। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

উপায়ান্তর না দেখে নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতি মণ্ডলীকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আজাদ হিন্দ বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো।

এই সময় এক সংবাদ প্রচার করা হয় যে—বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক লোকের মনে সন্দেহ আছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকীর্তিমান বিপ্লবী হিসাবে নেতাজী চিরদিন ভারতবাসীর অন্তরে বেঁচে থাকবেন। তাঁর বাণী ছিল—

"বিনা রক্ত দানে কখনও স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয় না।"

"আমার স্বপ্ন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।"

"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।"

আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন দলের নাম ছিল—'সুভাষ ব্রিগেড', 'গান্ধী ব্রিগেড', 'নেহেরু ব্রিগেড' ও 'আজাদ ব্রিগেড' প্রভৃতি।

দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার শুরু হয়। সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হন এই বাহিনীর তিনজন সেনাপতি। কিন্তু এই বিচারের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বেগতিক দেখে বিচার বন্ধ করে দেয়।

এইভাবে সেদিন জনসাধারণের কাছে ইংরেজ সরকার মাথা নত করে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর প্রধানদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন

১। সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় অন্তরীণ ছিলেন ?

২। সুভাষচন্দ্র পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?

৩। টোকিওতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ ভারতীয় নেতার সাক্ষাৎ হয় ?

৪। সুভাষচন্দ্রের নাম নেতাজী হলো কেন ?

৫। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিদের কোথায় বিচার হয় ?

৬। আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক একটি দলের নাম কি ছিল ?

৭। নেতাজীর বাণী কি ছিল ?



আগষ্ট আন্দোলন

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করলো। ইংরেজ সরকারকে সাবধান করে দিল কংগ্রেস, যদি তারা স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ না করে, তবে ব্যাপক-ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। ভয় পেয়ে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের জেলে পাঠালো। জেলখানার বাইরে কোন নেতা রইলেন না। নেতাহীন জনসাধারণ ইচ্ছামত সরকারী অফিসে আগুন ধরিয়ে দিল, সরকারের কোষাগার (ট্রেজারী) লুঠ করলে। ডাকঘরে আগুন দিল এবং টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। রেললাইন নষ্ট করে দিল অনেক জায়গায়, কলিকাতার রাজপথে জ্বলে উঠলো ট্রাম। ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি চালাতে লাগলো নির্মমভাবে। অনেকে গুলির আঘাতে প্রাণ দিলেন। এই সময় মেদিনীপুর জেলার একটা ঘটনা সকলকে বিস্মিত করে দিল।

থানার উপর জাতীয় পতাকা তুলতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নিলেন কয়েকজন বিপ্লবী। এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন একজন তিয়াত্তর বছরের বয়স্কা বৃদ্ধা। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তিনি। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সমস্ত দেশবাসী, আর সেই সঙ্গে প্রস্তুত হলো ইংরেজ সরকারের পুলিশবাহিনী।

থানার কাছে এগিয়ে যেতেই বাধা দিল পুলিশ। উত্তেজিত জনতাকে দমন করতে গুলি চালাতে লাগলো তারা। হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগলো সেই বৃদ্ধা জননীর বুকে। 'বন্দেমাতরম্' বলে পড়ে গেলেন তিনি মাটিতে, আর উঠলেন না। এই মহীয়সী নারী কে জানো? এঁর নাম মাতঙ্গিনী হাজরা।

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে ইনি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। মেদিনীপুরের এই মহীয়সী নারী ছিলেন পল্লীবাংলার শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তি। তাঁর মত শক্তিময়ী জননীর জন্যে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরা গর্বিত।

প্রশ্ন

১। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কবে শুরু হয়?
২। মাতঙ্গিনী হাজরা কি জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন?
৩। আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কি জান লেখ।
৪। মাতঙ্গিনী হাজরা কিভাবে প্রাণ হারালেন?
৫। মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্য গর্বিত কেন?



স্বাধীনতা লাভ

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে ইংরেজ সরকার খুব ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তার উপর ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ইংরেজরা বুঝতে পারলো, আর এদেশে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই একটি প্রতিনিধি দল ভারতে এলো আলাপ-আলোচনার জন্যে। এই আলোচনায় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করলো, কিন্তু মুসলীম লীগ মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান দাবি করে বসলো।

১৯৪৭ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষকে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে তুটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করে দেওয়া হবে।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত এই তুই রাষ্ট্রে ভাগ ক'রে দিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিল। দীর্ঘদিন পরাধীনতার পর ভারত আবার স্বাধীনতা লাভ করলো। একদা পলাশীর আম্রকাননে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আবার নব-সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ভারতের আকাশ।

স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীরূপে জওহরলাল নেহেরু সোনার ভারত গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

জওহরলাল নেহেরু এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, মাতার নাম স্বরূপরানী।

জওহরলাল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং চরিত্র মাধুর্য প্রভৃতি গুণের জন্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে উঠেন। জীবনে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে তিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দীর্ঘ সতেরো বছর প্রধান মন্ত্রীরূপে ভারতের সেবা ক'রে এই মহামানব ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে মহাপ্রয়াণ করেন।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে এগিয়ে এলেন আর একজন কর্মযোগী দেশপ্রেমিক। বিহারের রাজধানী পাটনা শহরে এঁর জন্ম হয়। পৈতৃক বাসস্থান বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার শ্রীপুরে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর ছিলেন ইনি। এঁর নাম বিধানচন্দ্র রায়। কলিকাতার শিক্ষা শেষ ক'রে বিলাতে গেলেন চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করতে।


ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

সেখান থেকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হয়ে ভারতে ফিরে এলেন। ক্রমে ইনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অন্যতম হয়ে উঠলেন। ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। তা ছাড়া যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে অনেক জনহিতকর কাজ করে গেছেন। নতুন নতুন শিল্প এবং জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার নায়ক ছিলেন তিনি। এইজন্যে তাঁকে 'বলা হয় নতুন পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা।'

১৯৬২ সালের ১লা জুলাই জন্মদিনে কলিকাতায় মৃত্যু হয় এই কর্মযোগীর। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুতে শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বাঙালী কোনদিন তাঁর কথা ভুলবে না।

প্রশ্ন

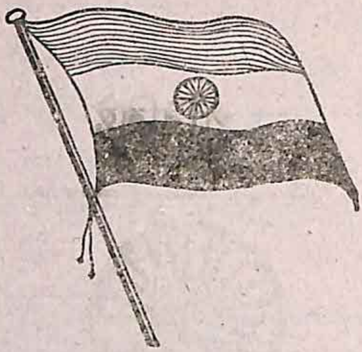
১। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কবে ঘোষিত হয়েছিল এবং কে, ঘোষণা করেছিলেন ?
২। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কত সালে এবং কবে এদেশ থেকে বিদায় নেয় ?
৩। জওহরলাল সম্বন্ধে কি জানো ?
৪। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু যুগে যুগে মানুষের সেই অধিকার হয়েছে পদদলিত। পলাশীর প্রান্তরে একদিন বণিক ইংরেজের হাতে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য হয়েছিল অস্তমিত। তারপর অনেক কাঁটায় ছাওয়া পথ পার হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই-আগস্ট ভারত আবার হলো স্বাধীন। তোমরা সেই স্বাধীন ভারতের নাগরিক। এই স্বাধীনতা যে সহজে অর্জিত হয়নি তার সামান্য পরিচয় তোমরা পেয়েছ এই বই থেকে। কিন্তু যেটুকু বলা হয়েছে তার থেকে অনেক অনেক গুণ থেকে গেছে না-বলা কাহিনী। আরও কত শহীদের রক্তে রাঙা হয়েছে ভারতের মাটি তা বলে শেষ করা যায় না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষও অকাতরে দিয়েছে তাদের রক্ত। তাদের কথা লেখা নেই কোনো ইতিহাসে। তোমরা বড়ো হয়ে জানবে এই সব কথা।

সহস্র শহীদের রক্তে ভারত হয়েছে স্বাধীন। রচিত হলো ভারতের সংবিধান। ভারত আজ এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সবশেষে তোমাদের বলবো সেই স্বাধীন ভারত সম্পর্কে কয়েকটি জানার কথা।

● ভারতের জাতীয় পতাকা ঃ



স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাছে সবচেয়ে পবিত্র তার সংবিধান ও জাতীয় পতাকা। ভারতের জাতীয় পতাকা তোমরা সকলেই দেখেছো। গেরুয়া, সাদা আর সবুজ এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আমাদের গৌরবের বস্তু। পতাকার এই রঙগুলো কিন্তু গভীর অর্থবহ। পতাকা লম্বায় যতটা হবে, পাশে চওড়ায় হবে তার দেড়গুণ। তার মাঝে তিনটি রঙ হবে সমান মাপের। উপরের গেরুয়া রঙ ত্যাগ এবং সাহসের প্রতীক। তার নিচে সাদা—তা সত্য ও শান্তির প্রতীক: এর মাঝখানে আছে অশোক চক্র। যাতে আছে চব্বিশটি দণ্ড। এই চক্র গতির প্রতীক। আর নিচে আছে সবুজ রঙ যা বিশ্বাস ও শ্যামলতার প্রতীক।

এই আমাদের জাতীয় পতাকা। এর মর্যাদা রক্ষা করা যে কোনো সৎ নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। জাতীয় পতাকা ব্যবহারেও অনেক নিয়ম আছে। তাকে মেনে চলতে হয়।

● ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ঃ

প্রত্যেক স্বাধীন জাতিরই আছে নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় পতাকার মতই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটি। প্রথমটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখা। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের মানস রূপটি

এতে সার্থক ভাবে বিস্তৃত। একটি বড়ো কবিতার কেবল প্রথম স্তবকটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়।—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় হে॥

যে-কোনো পবিত্র অনুষ্ঠানে এটুকুই গীত হয় জাতীয় সঙ্গীতরূপে। আমাদের অপর জাতীয় সঙ্গীতটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দেমাতরম্'।

ভারতের জাতীয় প্রতীক

ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভের শীর্ষভাগ। চারদিকে চারটি সিংহের সম্মুখভাগ গোলাকারে সজ্জিত—অবশ্য পেছনেরটি দেখা যায় না। নিচে স্তম্ভের গায়ে একটি চক্র। এই চক্রটিই শোভা পায় আমাদের জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্থলে। চক্রটির এক পাশে ধাবমান অশ্ব, অন্য পাশে এক বৃষ। এই স্তম্ভশীর্ষের নীচে জাতীয় প্রতীকটিতে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে মুণ্ডকোপনিষদের একটি বাণী—'সত্যমেব জয়তে'। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মহাভারতের মহাবাণী—সত্যেরই জয়। জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকার মতো জাতীয় প্রতীকও আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। এদের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।



স্বাধীন ভারতে তোমাদের জন্ম। সেই ভারতকে জানা, তার

স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখা, বিশ্বের দরবারে তাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করাই হবে তোমাদের সাধনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে, সভ্যতায় ভারত একদিন ছিল পৃথিবীর শীর্ষে। আমাদের সকলের ঐকান্তিক কামনা করলেই হবে না, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা রূপায়িত করতে হবে। কাজেই সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের।

জয়হিন্দ্